যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং প্রাসঙ্গিক আইনের বিশ্লেষণ
- একরামুল হক শামীম

১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই জাতীয় সংসদে তৎকালীন আইনমন্ত্রি শ্রী মনোরঞ্জন ধর বলেছিলেন, " আজকে বাংলাদেশে যে সব যুদ্ধাপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেজন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে যদি তারা বিনা বিচারে, বিনা শাস্তিতে রেহাই পেয়ে যান, তাহলে সমস্ত সভ্য জাতির চোখে আমরা পরিহাসের পাত্র হবো। এবং আমরা অত্যন্ত কদর্য নজীর স্থাপন করব। এই বিচার আমাদের পরমতম কর্তব্য।"

১৯৭৩ সালের পর পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ সময়। এই পর্যায়ে এসে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে যদি আমি বলি, আমরা সভ্য জাতির চোখে কেমন পরিহাসের পাত্র হয়েছি ? এই কি আমার বাংলাদেশ, যাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন এই দেশ তাদের হত্যার বিচার আজতক করতে পারে নি যে দেশ ? এই কি বাংলাদেশ, যেখানে স্বাধীনতার এতো বছর পরেও ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সত্যকে কথার তুবড়িতে মিথ্যা বানাতে চান স্বীকৃত কোন যুদ্ধাপরাধী।

যদি সারা বাংলাদেশে গণভোট চাওয়া হয়, কারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান ? তবে এটা দৃঢ়ভাবে বলা যায় প্রায় সবাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে থাকবেন। এতোকিছুর পরও কেন এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে না ? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাটা কোথায়? যেখানে প্রজাতন্ত্রের বেশিরভাগ লোক এই দাবির পক্ষে।

এ পর্যায়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তার আইনগত দিক নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন পাশ করা হয় ১৯৭২ সালে। আইনটির নাম Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 | এটি দালাল আইন নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা প্রবর্তিত দালাল আইনটির প্রয়োগ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী আইনটির আদেশ জারী হলেও পরবর্তীতে একই বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি, ১ জুন এবং ২৯ আগস্ট তারিখে তিনদফা সংশোধনীর মাধ্যমে আইনটি চূড়ান্ত হয়। পরবর্তীতে দালাল আইনের অধীনে ৩৭ হাজারের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিভিন্ন আদলতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়। এর পাশাপাশি সরকারি চাকুরিতে কর্মরতদের কেউ দালালী এবং যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা তা যাচাই করার জন্য ১৯৭২ সালের ১৩ জুন একটি আদেশ জারি করে যা তখন গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর দালাল আইনে আটক যে সকল ব্যক্তিদের বিরোদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ৫নং ধারার (ক) অনুচ্ছেদে যে বিধান রাখা হয় তাতে সত্যিকার অর্থে কোন যুদ্ধাপরাধী মুক্তি পাওয়ার কথা নয়। কারণ ঘোষণার ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে -

" যারা বর্ণিত আদেশের নিচের বর্ণিত ধারাসমূহে শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অথবা যাদের বিরোদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে অথবা যাদের বিরোদ্ধে নিম্নোক্ত ধরা মোতাবেক কোনটি অথবা সবকটি অভিযোগ থাকবে
(১) ১২১ (বাংলাদেশের বিরোদ্ধে যুদ্ধ চালানো অথবা চালানোর চেষ্টা), (২) ১২১ ক (বাংলাদেশের বিরোদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ষড়যন্ত্র), (৩) ১২৮ ক (রাষ্ট্রদ্রোহিতা), (৪) ৩০২ (হত্য), (৫) ৩০৪ (হত্যার চেষ্টা), (৬) ৩৬৩ (অপহরণ), (৭) ৩৬৪ (হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ) (৮) ৩৬৫ (আটক রাখার উদ্দেশ্যে অপহরণ), (৯) ৩৬৮ (অপহৃত ব্যক্তিকে গুম ও আটক রাখা), (১০) ৩৭৬ (ধর্ষণ), (১১) ৩৯২ (দস্যুবৃত্তি), (১২) ৩৯৪ (দস্যুবৃত্তিকালে আঘাত), (১৩) ৩৯৫ (ডাকাতি), (১৪) ৩৯৬ (খুনসহ ডাকাতি), (১৫) ৩৯৭ (হত্যা অথবা মারাত্নক আঘাতসহ দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতি), (১৬) ৪৩৫ (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধণ), (১৭) ৪৩৬ (বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার), (১৮) ফৌজদারী দন্ডবিধির ৪৩৬ (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে কোন জলযানের ক্ষতি সাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান। এসব অপরাধী কোনভাবেই ক্ষমার যোগ্য নন।"

এখন প্রশ্ন হলো সুনির্দিষ্টভাবে এই ১৮টি ধারা উল্লেখ করার পরও কি কেই বলতে পারে যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের ছাড়া পেয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে ?
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি এ সকল অপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল এবং তাদের বিচার কার্যক্রম চলতে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়।

সেই প্রসঙ্গে এই রচনায় আলোচনা না করে ফিরে যাই সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে। এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে একটা বিতর্ক থেকেই যায়। শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন কিসের ভিত্তিতে ? সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি কি শুধুই সহানুভূতিতার বিষয় নাকি সেখানে সাংবিধানিক কোন বৈধতা রয়েছে ? বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমা প্রদর্শনের সুযোগ রয়েছে। লক্ষ করি বর্তমান সংবিধানের ৪৯ নং অনুচ্ছেদ (১৯৭২ সালের সংবিধানের ৫৭ নং অনুচ্ছেদ)

" The President shall have power to grant pardons, reprieves and respites and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority."

অর্থাৎ " কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দন্ড মওকুফ স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।"

সুতরাং বলা যায়, শুধুমাত্র শাস্তি এবং দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার আছে রাষ্ট্রপ্রধানের। কিন্তু যারা শাস্তি কিংবা দন্ড পাননি তাদেরকে কি সাধারণ ক্ষমা করা যাবে?

সেই বিতর্কে না গিয়ে ফিরে আসি যুদ্ধরাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে। দালাল আইন বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না কিংবা বিচার সম্ভব নয় এমনটা মোটেও নয়। কারণ এখনো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে খ্যাত সংবিধানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি রয়েছে; রয়েছে ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ। এছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার সবচেয়ে কার্যকরী আইন The International crimes (Tribunals) Act 1973 এখনো রয়েছে।
এ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই আমাদের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সমন্ধে। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় এবং এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় ১৭ জুলাই। এই প্রথম সংশোধনীর বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচারের বিধান নিশ্চিত করা।

সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪৭(৩) অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই অনুচ্ছেদটির দিকে দৃষ্টি দেযা যাক -

“ Notwithstanding anything contained in this Constitution, no law nor any provision thereof providing for detention , prosecution or punishment of any person, who is a member of any armed or defence or auxiliary forces or who is a prisoner of war, for genocide, crimes against humanity or war crimes and other crimes under international law shall be deemed void or unlawful, or ever to have become void or unlawful, on the ground that such law or provision of any such law is inconsistent with, or repugnent to, any of the provision of this Constitution.”

অর্থাৎ, “ এই সংবিধান যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দন্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারনে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া হবে গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।”

অসমঞ্জস্য বা পরিপন্থীর কথা কেন আসছে, সে বিষয়টি বুঝতে হলে আলোকপাত করতে হবে সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা শিরোনামে বিধিবদ্ধ ৪৭ (ক) (১) এবং ৪৭ (খ) (২) অনুচ্ছেদ।

৪৭ (ক) (১) - “ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য নয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধনি নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হবে না।”

৪৭ (ক) (২) - “ এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।”

এখন সংবিধানের ৩৫ (১) নং অনুচ্ছেদের দিকে লক্ষ্য করি -

“ অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল এইরুপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যাতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দন্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দন্ড দেওয়া যাইবে না।”

অনুচ্ছেদ ৪৭ (৩) এর পর অনুচ্ছেদ ৩৫ (১) এর আলোচনা নিয়ে আসার কারণ হলো সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর অন্যতম উপলক্ষ্যই হলো এই ৩৫ (১) নং অনুচ্ছেদ। “ ex post facto” laws বলে আইনে একটা টার্ম রয়েছে।

Ex post facto law is one which, in its operation, (1) makes that criminal which was not so at the time the act was not so at the time the act was performed, or (2) which increases the punishment, or in short which in relation to the offence or its consequence, alters the situation of a party to his detriment or disadvantage.

আমাদের সংবিধানে ex post facto law সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি হলো ৩৫ (১)। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে কোন আইন যাতে ex post facto টার্মটির সঙ্গে বিরোধ না করে সেজন্যই সংবিধানে ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।

এবার ফিরে আসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত কার্যকরী আইন The International crimes (Tribunals) Act, 1973 প্রসঙ্গে। ১৯৭৩ সালের ২১ জুলাই জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয় এই আইন। আমরা লক্ষ্য করি ১৭ জুলাই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার তিনদিন পরেই The International crimes (Tribunals) Act, 1973পাশ হয়। তারমানে সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইনটির কথা বলা হয়েছিল The International crimes (Tribunals) Act, 1973 -ই হচ্ছে সেই আইন। অর্থাৎ এই আইনটি সংবিধানের অন্য কোন অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসমঞ্জস্য বা পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না।

সুতরাং যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে এর দোহাই দেখান তাদের জন্য মোক্ষম জবাব হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ। এখানে একটি অজুহাতের জবাব দেয়া হলো। সংবিধানের চেয়ে বড় আইনতো বাংলাদেশে অন্য কোন আইন নয়।

আরেকটি অজুহাত হচ্ছে সিমলা চুক্তি। সিমলা চুক্তি সাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালের ২ জুলাই। এই চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় হয়েছে। কিন্তু এই চুক্তিতে কোথাও বলা নাই যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না।

এসবকিছুর পর আরেকটি বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই সংবিধান এই দেশের সর্বোচ্চ আইন। অন্য যেকোন আইনের সাথে অসামঞ্জস্য কিংবা পরিপন্থী হলে সংবিধানের আইন প্রাধান্য পাবে। সংবিধানের ৪৭ (৩) ধারায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়েছে। এবং এই ধরার ভিত্তিতেই পরবর্তীতে The International crimes (Tribunals) Act, 1973 কার্যকর হয়। এই অ্যাক্টটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে বলে, যার সমর্থনে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ। কোন ধরনের চুক্তি কিংবা আলোচনা নিশ্চয়ই সংবিধানের আইনের উপরে স্থান পেতে পারে না। তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে আইনগত কোন বাধা নেই।

প্রসঙ্গত একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের শিরোনাম মৌলিক অধিকার। এর অধীনে ২৬ নং থেকে ৪৭ (ক) নং অনুচ্ছেদ রয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এই অনুচ্ছেদগুলো অবশ্যই কার্যকর করা। ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার অংশে পড়ে। সংবিধানের ২য় ভাগে রয়েছে রাস্ট্র পরিচালনার মুলনীতি তার অধীনে আছে ৮ থেকে ২৫ নং অনুচ্ছেদ। রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতিগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। কিন্তু মৌলিক অধিকার অংশের যেকোন অনুচ্ছেদের দাবি রাষ্ট্রের নাগরিক করতেই পারে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরা ৪৭ (৩) নং অনুচ্ছেদ কার্যকর এবং বাস্তবায়নের দাবি করতেই পারি। সুতরাং জোর গলায় বলতে পারি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে।
এখন ফিরে আসি The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর খুটিনাটি বিষয়ে। ১৯৭৩ সালের এই আইনটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন।

The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর Jurisdiction অর্থাৎ বিচারের এখতিয়ার আলোচিত হয়েছে আইনটির ৩(১) ধারায়। সেখানে বলা হয়েছে-

“ A tribunal shall have the power to try and punish any person irrespective of his nationality who, being a member of any armed, defence or auxiliary force commits or has committed, in the territorry of Bangladesh, whether before or after the commencement of this Act, any of the following crimes.”
উপরিউক্ত ধারাটির দুটি কি লক্ষ্য করি।বলা হয়েছে any person irrespective of his nationality আবার বলা হয়েছে whether before or after the commencement of this Act; অর্থাৎ যেকোন দেশের নাগরিককে এই আইনের মাধ্যমে বিচার করা যাবে। পাশাপাশি অপরাধ এই আইন প্রণয়নের আগে কিংবা পরে যে সময়ই হোক না কেন, অপরাধের বিচার সম্ভব এই আইনের মাধ্যমেই।

৩(২) ধারায় বেশ কিছু ধরনের অপরাধের কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর জন্য এই আইন অনুযায়ী Jurisdiction রয়েছে। এগুলো হলো (a) Crimes against Humanity (b) Crimes against Peace (c) Genocide (d) War crimes (e) Violation of any humanitarian rules applicable in armed conflicts laid down in the Geneva Convertion of 1949 (f) any other crimes under international law (g) attempt, abetment on conspiracy to commit any such crimes (h) complicity in our failure to present commission of any such crimes.

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী বাহিনীরা এর প্রতিটি অপরাধ করেছে। সুতরাং এই আইনের অধীনে তাদের বিচার হতেই হবে।

লক্ষ্য করা যাক সংবিধানের ৪৭(৩) ধারা এবং The International Crimes (Tribunals) Act 1973 দুই জায়গাতেই auxiliary forces এর কথা বলা হয়েছে। এই auxiliary forces এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে 1973 সালের আইনের 2(a) ধারায়। সেখানে বলা হয়েছে-

“auxiliary forces” includes forces placed under the control of the Armed Forces for operational, administrative, static and other purpose.

সংজ্ঞার control of the Armed Forces কথাটি মনে রাখি এবং পরবর্তীতে রাজাকার বাহিনী গঠনের দিকে দৃষ্টিপাত করি। ১৯৭১ সালের ২ আগস্ট রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় The East Pakistan Razakars Ordinance, 1972 এর মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি গেজেট নোটিফিকেশনের (No. 4852/583/PS-1y/3659/D-2A) মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীকে সরাসরি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অধীনে আনা হয়। গেজেট নোটিফিকেশনের (b) clause টি লক্ষ্য করি-

The officer of the Pakistan Army under whose command any member of the Razakarsis placed shall exercise the same powers in relation to that mwmber as he is authorized to exercise under the side Act in relation to a member of the Pakistan Army place under his command.

সুতরাং আমরা বলতে পারি ১৯৭৩ সালের আইনটির মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী, আল বদর বাহিনী এবং আল শামস বাহিনীর সদস্যদের বিচার করা সম্ভব। এবং শিগগিরই এই বিচার কাজ শুরু করা উচিত।
এই যে পর্যালোচনা শেষে বললাম The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব, তারপরেও কেন এতবছর হয়ে গেলেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে না? সেটা রীতিমতো বড় রকমের প্রশ্ন বটে। The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর অধীনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করতে হলে tribunal গঠন করতে হবে। আর সেই tribunal গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর ৬ নং ধারায়।৬(১) ধারায় বলা হয়েছে-
“For the purpose of section 3, the Government may, by notification in the official Gazette, set up one or more Tribunals, each consisting of a Chairman and not less than two and not more than four other members.”

এখানে লক্ষ্য করুন may শব্দটির ব্যবহার। অর্থাৎ সরকার ইচ্ছে করলে এক বা একের অধিক tribunal গঠন করতে পারবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সরকারেরই এই ইচ্ছাটা হয় নি। তাই এত বছর পরেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয় নি।তিন অক্ষরের দুর্বল শব্দের ব্যবহার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ দীর্ঘায়িত করেছে। অথচ এখানে may শব্দের পরিবর্তে shall অথবা will ব্যবহার করলে সরকারকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য অবশ্যই tribunal গঠন করতে হতো। আর tribunal গঠন হলে নিঃসন্দেহে যুদ্ধাপরাধদের বিচার সম্ভব।

বর্তমান সরকারের আমলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি আলোচিত বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।বর্তমান সেনাপ্রধাণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা বলেছেন। মিডিয়ায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। জনসাধারণও চাচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করতে পারি- সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য tribunal গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করবে।

আর এই কাজটি যদি বর্তমান সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হয় তাহলে অন্তত এই সরকার যেন The International Crimes (Tribunals) Act 1973 এর ৬(১) ধারায় may শব্দের পরিবর্তে shall অথবা will শব্দের প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করে যায়। যাতে পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ এগিয়ে যায়।

আলোচনার সবশেষে পরিস্কার করে বলা যাক, স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন আমরা যুদ্ধাপরাধদের বিচার চাই। হিংসা, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই না। আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই মানবতার ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। মানবতার বিরোদ্ধে ১৯৭১ সালে যে অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল তার বিচার অবশ্যই প্রত্যাশিত। পরবর্তীতে যাতে কখনোই এ ধরনের অপরাধ সংগঠিত না হয় তা নিশ্চিতের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে।

তৎকালীন আইমন্ত্রি শ্রী মনোরঞ্জন ধরের কথাও মনে পড়ে। আমরা সমস্ত সভ্য জাতির চোখে পরিহাসের পাত্র হতে চাই না। যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে Limitation Act প্রযোজ্য নয়। সুতরাং আজ হোক কাল হোক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে। সেই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। আবারো মনে করিয়ে দিতে চাই শহীদদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়ে, স্বাধীন দেশে বসবাস করে সমস্ত সভ্য জাতির চোখে আমরা পরিহাসের পাত্র হতে চাই না। চাই না ইতিহাসে অত্যন্ত কদর্য নজীর স্থাপন করতে। সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই।

সূত্র :

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।
২. The Bangladesh Collaborators (secial Tribunals) (Amendment) Order 1972
৩. The International Crimes (Tribunals) Act 1973
৪. Constitutional Law of Bangladesh; Mahmudul Islam
৫. যুদ্ধাপরাধ এবং জেনেভা কনভেনশন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত- আইজ্যাক রবিনসন/জাভেদ হাসান মাহমুদ
৬. যুদ্ধাপরাধদের বিচার এবং বাংলাদেশের সংবিধন – কে এম সোবহান
৭. একাত্তুরের ঘাতকদের কেন বিচার চাই- আমান-উদ-দৌলা

Edit this page (if you have permission) | Report spam
Google Docs -- Web word processing, presentations and spreadsheets.